১৫

দুর্বল শ্রেণি: দলিত

(Weaker Section: Dalits)

প্রত্যেক সমাজে প্রধানত দুটি শ্রেণি পাওয়া যায়। একটি হল সম্পন্ন শ্রেণি যাকে পুঁজিপতি শ্রেণি, অভিজাত শ্রেণি বা উচ্চ শ্রেণি বলে উল্লেখ করা হয় এবং অপরটি হল দরিদ্র শ্রেণি, যাকে শ্রমিক শ্রেণি, দুর্বল শ্রেণি, দলিত শ্রেণি বা পিছিয়ে পড়া শ্রেণি নামে সম্বোধিত করা হয়। দলিত শ্রেণির আলোচনা বর্তমানে নানা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে করা হয়। সমাজতাত্ত্বিকগণের মধ্যে এমন অনেক চিন্তাবিদ আছেন যারা সমাজতত্ত্বে শ্রমিক এবং সমাজের দুর্বল শ্রেণির আলোচনার ওপর বেশি গুরুত্ব দেন। এদের মধ্যে মার্ক্সবাদী সমাজতাত্ত্বিক এবং Radical Sociologist প্রমুখ রয়েছেন। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে দুর্বল শ্রেণি একটি এমন শ্রেণি যে বহু যুগ ধরে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে শোষিত এবং উপেক্ষিত হয়ে আসছে। দেশের প্রায় ৪০% মানুষ এই শ্রেণির অন্তর্গত। বর্তমানে এই শ্রেণি রাজনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। এরা বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের অধিকারী হচ্ছেন।

স্বাধীন ভারতের সংবিধান নির্মাতাগণ দেশের দুর্বল শ্রেণির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন এবং তাদের বিকাশ ও উত্থানের জন্য নানা ব্যবস্থা করেছেন। স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের দেশের নেতাগণ দেশে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ স্থাপনের সঙ্কল্প ব্যক্ত করেন যা সাম্য ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, যাতে অল্প সংখ্যক এবং দুর্বল শ্রেণির মঙ্গলের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। দুর্বল শ্রেণির উন্নতির জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, অন্ত্যোদয় যোজনা, পিছিয়ে পড়া শ্রেণির উন্নতি ইত্যাদি গ্রহণ করা হয়েছে, নানা চেষ্টা করা সত্ত্বেও দুর্বল শ্রেণিগুলির সমস্যার সমাধান তেমন হয়নি। এমনকী অর্থনৈতিক বৈষম্য দিন-দিন বেড়েই চলেছে যা বিকাশ যোজনার ক্ষেত্রে খুব চিন্তার বিষয়। বর্তমানে দুর্বল শ্রেণিগুলির মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে। কয়েক বছর ধরে সামাজিক বৈষম্য এবং তার সঙ্গে জড়িত আন্দোলনের যেন প্রবাহ চলছে, ভূমিহীন কৃষক ও জমিদারের মধ্যে উচ্চ এবং নিম্ন জাতির মধ্যে। এই আন্দোলন এবং সংঘর্ষ সমাজের আর্থিক বৈষম্য এবং দুর্বল শ্রেণির রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিণাম। এই কারণে প্রথমেই আমাদের জানতে হবে— দুর্বল শ্রেণি কাকে বলে?

দুর্বল শ্রেণির ধারণা

(Concept of Weaker Sections)

সাংবিধানিক দৃষ্টিতে দুর্বল বা দলিত শ্রেণির অন্তর্গত হল তপশিলি জাতি-উপজাতি এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণি। এর মধ্যে সমাজের সাহায্য না পাওয়া শ্রেণিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ভারতীয় সংবিধান ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের ওপর জোর দেয়। সুতরাং সংবিধান প্রণেতাগণ মনে করেন যে যদি সাম্যকে প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাহলে এই দলিত, দুর্বল শ্রেণিগুলির উন্নতি করতে হবে এবং অন্যান্য উচ্চ শ্রেণি এবং সবর্ণ হিন্দুদের মতো তাদের বিকাশের নানা সুবিধা প্রদান করতে হবে। যদিও সংবিধানের ৪৬নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে— ''রাষ্ট্র জনতার দুর্বলতার অঙ্গকে, বিশেষত, তপশিলি জাতি-উপজাতিদের শিক্ষা ও অর্থ সংক্রান্ত ব্যবস্থাকে বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে রক্ষা করবে এবং সামাজিক অন্যায় ও সকল প্রকার শোষণ থেকে তাদের রক্ষা করবে।'' ভারতের সংবিধানে দুর্বল শ্রেণি শব্দের যে ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে তাতে একথা বোঝা যায় যে এর অন্তর্গত তপশিলি জাতি-উপজাতি ছাড়াও কিছু শ্রেণিকে সম্মিলিত করা হয়েছে। কিন্তু তারা কোন শ্রেণির তা স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি।

এম. ডি. দেশাই, জি পার্থসারথী, জি. ডি. রাজারাও, বি. এস. চৌহান এবং যোগেশ অটল ইত্যাদি অর্থনীতিবিদ এবং সমাজতত্ত্ববিদগণ দুর্বল শ্রেণির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আর্থিক-সামাজিক মানদণ্ড নির্বাচন করেন। এই পণ্ডিতগণের মতানুসারে দুর্বল শ্রেণি বলতে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিগণ-এর কথা বলা হয়েছে:

(i) সেইসব ব্যক্তি যারা নিজেদের জীবনের ন্যূনতম চাহিদাকে পূরণ করতে পারে না, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার সুবিধা পেতে ও অসমর্থ এবং যাদের আয় দারিদ্র্য সীমা (Poverty Line)-র অনেক নীচে।

(ii) সেই ব্যক্তি যারা মুখ্যত দৈনিক মজুরির ওপর আশ্রিত এবং সেটিও অনিয়মিত ও ঋতু পরিবর্তনের ওপর নির্ভরশীল।

(iii) সেইসব ব্যক্তি যারা উৎপাদনে সক্রিয় সহযোগিতা করে কিন্তু তবুও তাদের দৈনন্দিন ভরণপোষণ হয় না। তারা নিজেদের দৈনিক চাহিদাগুলিকেও পূরণ করার জন্য ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

(iv) সেইসব ব্যক্তি যাদের কাছে এমন টাকাও থাকে না যা দিয়ে কাঁচামাল ও অন্যান্য উৎপাদিত দ্রব্য কিনতে পারে।

(v) এরা হলেন প্রান্তিক কৃষক যারা জলসেচ ইত্যাদির সুবিধা থেকেও বঞ্চিত।

উপরিউক্ত সকল মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে দুর্বল শ্রেণি বলতে সেইসব শ্রেণির কথা উল্লেখ করা যায় যারা সামাজিক-আর্থিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এরা শোষিত এবং পিছিয়ে পড়া। এই মানদণ্ডের ভিত্তিতে তপশিলি জাতি-উপজাতি, পিছিয়ে পড়া শ্রেণি, লঘু ও সীমান্ত কৃষকগণ, ভূমিহীন শ্রমিকগণ, বন্দী শ্রমিকগণ এবং পরম্পরাগত কারিগরগণকে দুর্বল শ্রেণির অন্তর্গত করা হয়েছে। এই দুর্বল শ্রেণির একটি ভাগ দলিত (তপশিলি জাতি) শ্রেণির সমস্যাগুলি এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত নানা দিক এবং দ্বিতীয় ভাগে অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণির সমস্যাগুলি আলোচনা করা হল।

প্রশ্ন হল, দলিত কারা এবং কবে থেকে ও কি কারণে এদের অবস্থার অবনতি হয়? আর্যদের ঋগ্‌বেদে কেবল তিনটি জাতি— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। আমরা জানি যে 'শূদ্র জাতি' (দলিত শ্রেণি)-র সৃষ্টি হয়েছে ঋক্‌বেদের সময় থেকে। শূদ্র (দাস)-কে সমাজে নিম্নতম স্থান প্রদান করা হয়েছে। তারা জাতিগত ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিতে আর্যদের থেকে আলাদা। ধর্মের দিক থেকেও এরা আর্যদের বিপরীত ছিল। কিন্তু সমাজতত্ত্ববিদকে

অনুসরণ করে বলা যায় যে দলিতরা যে কেবল আর্যদের দেবতাদের বিরুদ্ধে ছিল তাই নয়, তারা বলিও দিত না, এমনকী পুরোহিতদেরও তারা কোনো রকম উপহার দিত না। আর্যরা এই দাসদের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত শব্দ প্রয়োগ করে।

অন্যাবৃত্ত 'অংশ' মৃহধক। এই শূদ্রদের সামাজিক বৈশিষ্ট্য ও ধর্মীয় অধিকারের দৃষ্টিতে নিম্নতম স্থান প্রদান করা হয়েছে। তাদের যজ্ঞ ও বলি দেবার অধিকার ছিল না। এদের ঘৃণিত, অপবিত্র ও অশুদ্ধ প্রাণী বলে মনে করা হত। বৈদিক যুগে কেবল প্রথম তিনটি জাতিকে মেনে নেওয়া হয়। শূদ্রদের ধর্মীয় প্রথা পালন করা নিষেধ ছিল। শূদ্রদের অস্পৃশ্য হওয়ার বিবরটি সম্ভবত 'সূত্র' কালেই বিকশিত হয়েছে। অস্পৃশ্যতার পিছনে অপবিত্রতার ধারণা ছিল।

শূদ্রদের নিম্ন আর্থিক অবস্থা থেকে জানা যায় যে সমাজের স্তর বিন্যাসে তাদের স্থান নিম্ন ছিল। শূদ্রদের পশু বা ধনসম্পত্তি ছিল না। এরা ভূমিহীন শ্রমিক বা ঘরের চাকর হিসাবে কাজ করত। এক সূত্রে বলা হয়েছে যে "শূদ্রদের জীবন কেবল উচ্চ বর্ণের সেবা করেই কাটত।" আজও আলোচনার মাধ্যমে নিম্নোক্ত কথাগুলি উঠে আসে:

(i) শূদ্র অনার্য ছিল এবং শূদ্র শব্দকে বর্ণের অর্থে বোঝা যেত না।

(ii) খ্রিস্ট পূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে তাদের ধর্মীয়, সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা নিম্ন ছিল।

(iii) আদিকালে (বেদ, ব্রাহ্মণ ও সূত্রে) তারা অস্পৃশ্য ছিল না।

(iv) সাংস্কৃতিক ব্রাহ্মণকাল থেকেই অস্পৃশ্যতার বিচার শুরু হয়।

দলিত শ্রেণি (তপশিলি জাতি বা অস্পৃশ্য)
(Dalits or Scheduled Castes or Untouchables)

'তপশিলি জাতি' শব্দের প্রয়োগ সর্বপ্রথম ১৯৩৫ সালে সাইমন কমিশন দ্বারা করা হয়েছে। এই শব্দের প্রয়োগ অস্পৃশ্য লোকেদের জন্য করা হয়েছে। আম্বেদকরের মতে আদিকালে ভারতে এদের 'ভগ্ন পুরুষ' (Broken Men) বা বার্হ্যজাতি (Outcast) মনে করা হত। ইংরেজগণ এদের দলিত শ্রেণি (Depressed Class) বলত। ১৯৩১ সালের জনগণনা অনুসারে এদের বাইরের জাতি (Exterior Caste) বলে সম্বোধিত করা হয়েছে। মহাত্মা গান্ধি তাদের 'হরিজন' নামে ডেকেছেন। ব্রিটিশ যুগে অস্পৃশ্যদের দলিত শ্রেণি (Depressed Class) বলে ডাকা হত। অস্পৃশ্য জাতিদের নামকরণ নিয়ে মতভেদ আছে। এদের অস্পৃশ্য, দলিত, বাইরের জাতি, হরিজন এবং তপশিলি জাতি নামে সম্বোধিত করা হতে থাকে। এদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হওয়ার ফলে 'অস্পৃশ্য' শব্দের জায়গায় দলিত শ্রেণি শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে। আর্য সমাজ মনে করত যে, এই শ্রেণি অস্পৃশ্য না হয়ে দলিত, কারণ সমাজ এদের দাবিয়ে রেখেছে এবং সব রকম অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখেছে। এদের এই নিম্ন অবস্থার জন্য এরা দায়ী নয়, বরং সমাজই দায়ী। ১৯৩১ সালের জনগণনের আগে পর্যন্ত 'দলিত' শব্দেরই প্রয়োগ করা হত। এই জনগণনার সময় জনগণনাধিকারী 'দলিত' শব্দের জায়গায় 'বাইরের জাতি' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। এই শব্দের প্রয়োগের কারণ এই ছিল যে এই জাতিগুলির ভারতীয় সামাজিক কাঠামোয় কোনো স্থান ছিল না। ১৯৩৫ সালে আইনে এই সব লোকেদের কিছু বিশেষ সুবিধা প্রদানের জন্য একটি তালিকা তৈরি করা হয় যাতে বিভিন্ন অস্পৃশ্য জাতিগুলিকে সম্মিলিত

করা হয়েছে। এই তালিকার ওপর ভিত্তি করে আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে এই জাতিগুলির ক্ষেত্রে তপশিলি জাতি শব্দটির প্রয়োগ করা হয়। এদের জন্য তৈরি তালিকায় যে অস্পৃশ্য জাতিগুলিকে রাখা হয়েছে তাদের তপশিলি জাতি বলা হয়েছে। এই শ্রেণির লোকেদের 'দলিত' বলে মনে করা হয়। তপশিলি জাতিগুলির তালিকায় কিছু প্রধান জাতি আছে— চুহড়া, ডঙ্গী, চামার, ডোম, পাসী, রৈগর, মুচি, রাজবংশী, দোমড়, শানন, ঘিয়নি, পেরেয়াং এবং কোরী।

সাধারণত তপশিলি জাতিগুলিকে অস্পৃশ্য জাতিও বলা হয়। সুতরাং অস্পৃশ্যতার আধারেই এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। সাধারণত তপশিলি জাতিগুলির অর্থ ঐ জাতিগুলির সঙ্গেই যুক্ত করা হয় যাদের ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সুবিধা প্রদানের জন্য সংবিধানের তালিকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

তপশিলি জাতিগুলিকে এমন জাতিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে পরিভাষিত করা হয়েছে যারা ঘৃণিত পেশার দ্বারা জীবিকা অর্জন করে। কিন্তু অস্পৃশ্যতা নির্ধারণে এটি সর্বমান্য মাপকাঠি নয়। এর কারণ হল যে, অনেক এমন জাতিও আছে যারা ঘৃণিত পেশার সঙ্গে জড়িত আছে, কিন্তু তবুও তাদের সাংবিধানিক দিক থেকে তপশিলি জাতি বলে মানা হয়নি। অস্পৃশ্যতার সম্পর্ক প্রধানত পবিত্রতা এবং অপবিত্রতার সঙ্গে। হিন্দু সমাজে কিছু পেশাকে পবিত্র ও কিছু পেশাকে অপবিত্র বলে মনে করা হয়েছে। এখানে মানুষ বা পশুপক্ষীর শরীর থেকে নির্গত পদার্থকে অপবিত্র বলে মনে করা হয়েছে। এমন অবস্থায় এই পদার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত পেশায় নিযুক্ত জাতিগুলিকে অপবিত্র মনে করা হয়েছে এবং তাদের অস্পৃশ্য বলা হয়েছে। অস্পৃশ্যতা সমাজের একটি এমন ব্যবস্থা যার অন্তর্গত অস্পৃশ্য জাতির ব্যক্তিদের সবর্ণ হিন্দুগণ স্পর্শ করত না।

অস্পৃশ্যতার তাৎপর্য্য হল 'যা ছোঁওয়ার যোগ্য নয়'। অস্পৃশ্যতা এমন একটি ধারণা যে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির ছায়া মারালে, তাকে স্পর্শ করলে অপবিত্র হয়ে যায়। সবর্ণ হিন্দুদের অপবিত্র হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য অস্পৃশ্য লোকেদের থাকার পৃথক ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাদের ওপর অযোগ্যতার আরোপ লাগানো হয়েছে এবং তাদের সম্পর্ক থেকে বাঁচার জন্য নানা উপায় ঠিক করা হয়েছে। অস্পৃশ্যতার অন্তর্গত সেই সব জাতিগোষ্ঠী আছে যাদের স্পর্শ করলে অপর ব্যক্তি অপবিত্র হয়ে যায় এবং পুনরায় পবিত্র হওয়ার জন্য কিছু বিশেষ সংস্কার-পালন করতে হয়। এই সম্পর্কে ডা. কে. এন. শর্মা লিখেছেন, ''অস্পৃশ্য জাতি সেইগুলি যাদের স্পর্শ করলে একজন ব্যক্তি অপবিত্র হয়ে যায় এবং তাকে পবিত্র হওয়ার জন্য কিছু কৃত্য পালন করতে হয়।''

হটন-এর মতে সেই সব লোকেদের অস্পৃশ্য বলে মনে করা হয়েছে যারা (ক) উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন ব্রাহ্মণদের সেবা লাভ করার অযোগ্য, (খ) সবর্ণ হিন্দুদের সেবাকারী নাপিত, দর্জির সেবা পাওয়ার অযোগ্য, (গ) হিন্দু মন্দিরে প্রবেশের অযোগ্য, (ঘ) সার্বজনীন সুবিধা লাভ করার অযোগ্য, (ঙ) ঘৃণিত পেশা থেকে পৃথক হওয়ার অযোগ্য।

সারা দেশে অস্পৃশ্যদের প্রতি এক রকম ব্যবহার করা হয় না এবং দেশের বিভিন্ন অংশে অস্পৃশ্যদের সামাজিক স্তর বিন্যাসের মধ্যেও সমরূপতা দেখা যায় না। সুতরাং হটনের উপরিউক্ত আধারগুলিও অন্তিম ভাগ নয়। ড: ডি. এন. মজুমদার-এর মতে অস্পৃশ্য জাতিগুলি বিভিন্ন সামাজিক এবং রাজনৈতিক অযোগ্যতার দ্বারা পীড়িত, যাদের অযোগ্যতাগুলি উচ্চ জাতির দ্বারা পরম্পরাগত ভাবে নির্ধারিত এবং সামাজিক ভাবেও নির্দিষ্ট।

দলিত বা তপশিলি জাতির সংখ্যা
(Population of Dalits/Scheduled Castes)

যেখানে ১৯৩৫ সালে দলিত বা অস্পৃশ্য জাতির মোট সংখ্যা ছিল ২৭৭ এবং জনসংখ্যা ৫.০১ কোটি, সেখানে ১৯৮১ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১০,৪৭৫ কোটি এবং ১৯৯১ সালে ১৩.৮২ কোটি হয় যা দেশের ৮৪.৬৩ কোটি জনসংখ্যার ১৬.৪৮%। দলিত (তপশিলি জাতির)-এর সর্বাধিক জনসংখ্যা উত্তরপ্রদেশে। এখানে তপশিলি জনসংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার ২৩.৩%। এরপরে পশ্চিমবঙ্গ (১১.৪%), বিহার (৯.৬%), অন্ধ্রপ্রদেশ (৯.৬%), তামিলনাড়ু (৮.৫%), মধ্যপ্রদেশ (৭%), রাজস্থান (৫.৬%) কর্ণাটক (৫.৩%), পাঞ্জাব (৪.৩%) এবং মহারাষ্ট্র (৪.৩%)-এর স্থান। সমগ্র দেশের মোট তপশিলি জাতির জনসংখ্যার ৭৮.৯% এই রাজ্যগুলিতে বসবাস করে। তপশিলি জাতিগুলির সমগ্র জনসংখ্যা প্রায় ৮৪% গ্রামে বাস করে, তপশিলি জাতিগুলির প্রায় ১৬% লোক নগরে বাস করে।

এইসব লোকেরা পরিষ্কার করা, ময়লা ধোওয়া, চামড়া পরিষ্কার করার কাজে নিযুক্ত আছে। তপশিলি জাতির প্রায় ৪৫% লোক শ্রমিক শ্রেণির। এরা চামড়ার কাজ, তাঁতের কাজ, জেলের কাজ, দড়ি তৈরির কাজ, ধোপার কাজ, শিল্পীর কাজ, ফল-সব্জী বিক্রি করার কাজ, জুতো তৈরির কাজ, ঢোল বাজানোর কাজ করে। এছাড়া মুচি, কামার ও অন্যান্য বিবিধ কার্য করার লোকও আছে। প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বন্দী শ্রমিক তপশিলি জাতিরই অন্তর্গত। অন্য জাতির লোকেদের তুলনায় তপশিলি জাতির লোকেদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার অনেক কম হয়েছে। এদের মধ্যে শিক্ষার হার কম। এরা দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে। এরা আর্থিক ও সামাজিক শোষণের শিকার।

দলিত (তপশিলি জাতি/অস্পৃশ্য)-এর অযোগ্যতা
(Disabilities of Dalits-Scheduled Castes Untouchables)

দলিত জাতিগুলির অবস্থা জানার পরে আমরা এদের কিছু প্রধান সমস্যা এবং অযোগ্যতা সম্পর্কিত বিষয়গুলি আলোচনা করব। অযোগ্যতার তাৎপর্য হল— কোনো শ্রেণি অথবা গোষ্ঠীকে কিছু অধিকার বা সুবিধা লাভ করার অযোগ্য বলে মনে করা। ভারতে দলিত জাতিগুলির (তপশিলি জাতিগুলির) বহু অযোগ্যতা আছে। এই অযোগ্যতার কারণেই এরা জীবনে প্রগতির এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ পায় না। এই অযোগ্যতা একটা বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে, দাসের মতো জীবনযাপন করতে এদের বাধ্য করেছে এবং সব রকম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত রেখেছে। এখানে বলা প্রয়োজন যে দলিত এবং অস্পৃশ্য শ্রেণির এই অযোগ্যতা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত উপস্থিত ছিল। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই সংস্কার আন্দোলন ও পরে স্বাধীন ভারতে সরকারি প্রচেষ্টার ফলে এদের অযোগ্যতা অনেকটাই কমে আসে। স্মৃতিশাস্ত্র, পুরাণ ও ধর্মগ্রন্থগুলিতে দলিত (অস্পৃশ্য)-এর অযোগ্যতার উল্লেখ নিম্নলিখিত ভাবে করা হয়েছে।

I. দলিতের ধর্মীয় অযোগ্যতা—

1. দলিত (অস্পৃশ্য)-কে অপবিত্র মনে করা হয়েছে এবং তাদের ওপর কিছু কিছু অযোগ্যতা

চাপানো হয়েছে। এদের মন্দিরে প্রবেশ, পবিত্র নদীঘাটে যাওয়া এবং পবিত্র স্থানে খাওয়া, এমনকী নিজের ঘরেও দেবদেবীর পূজা করার কোনো অধিকার ছিল না। এদের বেদ এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়নেরও কোনো অনুমতি দেওয়া হয়নি।

2. দলিতদের সব রকম ধর্মীয় সুবিধা থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। দলিত এবং অস্পৃশ্যদের পূজা, আরাধনা, ভজন ইত্যাদি করারও অধিকার দেওয়া হয়নি। ব্রাহ্মণদেরও এদের জন্য পূজা, শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞ করানোর অনুমতি প্রদান করা হয়নি।

3. জন্ম থেকেই দলিতদের অপবিত্র মনে করা হয়েছে এবং এই কারণেই এদের শুদ্ধিকরণের জন্য কোনো সংস্কারমূলক ব্যবস্থা রাখা হয়নি। হিন্দুদের শুদ্ধিকরণের জন্য ধর্মগ্রন্থে ১৭টি সংস্কারের উল্লেখ আছে। এর অধিকারগুলি দলিতদের দেওয়া হয়নি।

II. দলিতদের সামাজিক অযোগ্যতা—

1. সবর্ণ হিন্দুদের সঙ্গে দলিতদের কোনো সামাজিক সম্পর্ক রাখা বা তাদের সম্মেলন, পঞ্চায়েতে, উৎসবে ইত্যাদিতে যোগ দেওয়ার কোনো অধিকার দেওয়া হয়নি। উচ্চ জাতির হিন্দুদের সাথে ভোজনের অধিকারও দেওয়া হয়নি।

2. দলিত শ্রেণিকে হিন্দুদের ব্যবহার করা কুয়ো থেকে জল নেওয়ার অধিকার দেওয়া হত না। এমনকী স্কুলে পড়া এবং ছাত্রাবাসে থাকার অনুমতিও দেওয়া হত না। উচ্চ জাতির কাজে লাগে এমন বস্তুগুলিকে এরা ব্যবহার করতে পারত না। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে পিতল ও তামার বাসন তারা ব্যবহার করতে পারত না। ভাল পোশাক এবং সোনার গয়না পরতে পারত না।

3. দলিত শ্রেণির শিক্ষালাভের কোনো অধিকার ছিল না। মেলা, হাট ইত্যাদি যোগ দিয়ে আনন্দ করার অধিকারও ছিল না। ফলে সমাজের একটি বড় শ্রেণি নিরক্ষর থেকে যায়।

4. আশ্চর্যের কথা হল এই যে দলিত শ্রেণির মধ্যেও স্তরবিন্যাস দেখতে পাওয়া যায় অর্থাৎ উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ দেখতে পাওয়া যায়। এই জাতি তিনশোর বেশি উচ্চ ও নিম্ন জাতি গোষ্ঠীতে বিভক্ত, যার মধ্যে প্রত্যেক গোষ্ঠীর মর্যাদা পরস্পরের থেকে উঁচু বা নীচু।

III. দলিত শ্রেণির অর্থনৈতিক অযোগ্যতা—

1. দলিত শ্রেণিকে সেইসব কাজের ভার দেওয়া হয়েছে যেগুলি সবর্ণ হিন্দুগণ করে না। এদের অর্থনৈতিক অবস্থা এত খারাপ যে সবর্ণদের এঁটো খাবার, ছেঁড়া কাপড় ও পরিত্যক্ত বস্তু দিয়ে নিজেদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে হয়। দলিত শ্রেণিকে মল-মূত্র পরিষ্কার করা, মরা পশু ফেলা ও চামড়ার জিনিস তৈরি করার কাজ দেওয়া হয়েছে। এরা গ্রামে ভূমিহীন শ্রমিক রূপে কাজ করে। এরা পরম্পরাগত পেশা ছেড়ে অন্য পেশা গ্রহণ করতে পারে না।

2. সম্পত্তি না থাকাও এদের একটা অযোগ্যতার কারণ। এদের ভূমির অধিকার ও ধন সংগ্রহের অধিকার দেওয়া হয়নি। দলিত শ্রেণিকে দাস হিসাবে নিজের প্রভুর সেবা করতে হত, অত্যন্ত কম মূল্য দিলেও।

IV. দলিত শ্রেণির রাজনৈতিক অযোগ্যতা—

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও দলিত শ্রেণিদের সব রকম অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল। শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করা, পরামর্শ দেওয়া, চাকুরি করা বা রাজনৈতিক সুরক্ষা লাভ করার কোনো অধিকার দলিত শ্রেণিকে দেওয়া হয়নি। সামান্য অপরাধের জন্য দলিতদের কঠোর শাস্তি পেতে হত।

দলিত শ্রেণির উপরিউক্ত অযোগ্যতাগুলি মধ্যযুগের সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। বর্তমানে এগুলি ইতিহাস হয়ে গেছে। বর্তমানে দলিত শ্রেণীর সমস্যা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক— ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক নয়। এরা দীর্ঘ সময় ধরে সব রকম অধিকার থেকে বঞ্চিত। নিরক্ষর ও চেতনাশূন্য হওয়ার কারণে এদের অবস্থার উন্নতি করতে সময় লাগবে। এদের প্রতি লোকেদের মনোবৃত্তিতে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসবে এবং সময়ান্তরে এটি সামাজিক জীবনের মুখ্য ধারা রূপে প্রবাহিত হতে পারবে। শহরগুলিতে এদের অবস্থার কিছু পরিবর্তন হলেও গ্রামগুলিতে এদের অবস্থার এখনও পরিবর্তন হয়নি। এর কারণ হল গ্রামগুলিতে সামাজিক পরিবর্তন ধীরগতিতে চলে।

এ কথা সত্য যে স্বাধীনতা লাভের পর দলিত বা অস্পৃশ্য শ্রেণির লোকেদের কিছু কিছু অযোগ্যতা দূর করা হয়েছে, কিছু অধিকার প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু এখানে একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, যতদিন এই শ্রেণির লোকেদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না দেওয়া হবে, তাদের অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে ততদিন এরা দেশের সাধারণ সুবিধাগুলিও লাভ করতে পারবে না। গান্ধিজিও বলেছিলেন যে যতদিন আমরা এই দলিত (হরিজন) শ্রেণিকে ভাইয়ের মতো না মানতে পারব ততদিন আমরা বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের কথা বলতে পারব না। দলিতদের মধ্যেও শ্রেণিভেদের সৃষ্টি হয়েছে। যে পরিবারের সদস্যগণ উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে উচ্চপদ লাভ করেছে অথবা সরকার থেকে ঋণ অথবা অন্যান্য সুবিধা লাভ করে নিজেদের অর্থনৈতিক মর্যাদায় উন্নতি করেছে তারা নিজেদের উচ্চ বলে মনে করছে। এদের উচিত নিজের জাতি, সমাজ এবং রাষ্ট্র সম্পর্কে চিন্তা করা এবং প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলা।

দলিত বা তপশিলি জাতিগুলির বেশির ভাগ লোক গ্রামে কৃষি-শ্রমিক হিসাবে এবং শিল্পক্ষেত্রে ও নগরগুলিতে কারখানায় অথবা অন্যত্র শ্রমিক হিসাবে কাজ করে। কখনও কখনও কিছু লোকের দ্বারা আজও ছোট ছোট কারণে এরা অমানবীয় ব্যবহার পায়, এমনকী অত্যাচারও করা হয়। যদি এরা অত্যাচারের প্রতিবাদ করে তাহলে গ্রাম থেকে সামাজিক ভাবে বহিষ্কার করা হয়। এই ধরনের ঘটনা মধ্যপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাত, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ ও কিছু কিছু অন্য রাজ্যগুলিতেও ঘটে। এর প্রধান কারণ হল ভূমিসংক্রান্ত বিরোধ, ন্যূনতম মজুরি দাবি, ঋণগ্রস্ততা ইত্যাদি। অন্যভাবে বলা যায় যে শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার ইচ্ছাই এইসব ঘটনার জন্য দায়ী।

তপশিলি জাতিগুলির (দলিতদের) কল্যাণ: সাংবিধানিক ব্যবস্থা
(Welfare of Scheduled Castes (Dalits): Constitutional Provisions)

তপশিলি জাতিগুলির (দলিত শ্রেণির) কল্যাণের জন্য সংবিধানে বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংবিধানে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির কল্যাণের দিকে মনোযোগ

দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫(১)-এ বলা হয়েছে যে রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের বিরুদ্ধে কেবল ধর্ম, বংশ, জাতি, লিঙ্গ, জন্মস্থান অথবা কোনো একটির ভিত্তিতে কোনো ভেদাভেদ করবে না। দোকানে, সার্বজনীন মনোরঞ্জনমূলক স্থানে এদের প্রবেশ করতে কেউ বাধা দিতে পারবে না। সাধারণের ব্যবহার্য কুয়ো, পুকুর, স্নানঘাট, রাস্তা ইত্যাদি ব্যবহারে বাধা দিতে পারবে না। অনুচ্ছেদ ১৭-তে অস্পৃশ্যতা দূর করে তার প্রচলন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ১৯-এ অস্পৃশ্যদের যে কোনো পেশা গ্রহণের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। অনুচ্ছেদ ২৫-এ হিন্দুদের সার্বজনীন ধর্মীয় স্থানের দরজা সকল জাতির জন্য খোলা রাখার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ২৯-এ পূর্ণ বা আংশিক সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কোনো নাগরিককে ধর্ম জাতি, বংশ অথবা ভাষার ভিত্তিতে শিক্ষার সুযোগ লাভে বঞ্চিত করা যাবে না একথা বলা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৪৬-এ বলা হয়েছে যে রাষ্ট্র দুর্বলতর লোকেদের অর্থাৎ তপশিলি জাতি ও আদিম জাতিগুলির শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক মঙ্গলের কথা চিন্তা করবে এবং সকল রকম সামাজিক অন্যায় এবং শোষণ থেকেও তাদের রক্ষা করবে। অনুচ্ছেদ ৩৩০, ৩৩২ এবং ৩৩৪-এ তপশিলি জাতিদের ও আদিম জাতিদের জন্য সংবিধান চালু হওয়ার পর ৩০ বছর পর্যন্ত লোকসভা, বিধানসভা, গ্রাম পঞ্চায়েতে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে এই কার্যক্রম ২০১০ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। অনুচ্ছেদ ৩৩৫-এ বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদের নিয়োগের ক্ষেত্রেও তপশিলি জাতি ও আদিম জাতিদের কথা স্মরণে রাখতে হবে। অনুচ্ছেদ ১৯৬ এবং ৩৩৮ অনুসারে তপশিলি জাতিদের কল্যাণের জন্য রাজ্যে পরামর্শ পরিষদ এবং পৃথক পৃথক বিভাগের স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাথে একথাও বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রপতি তপশিলি জাতিদের ও আদিম জাতিদের জন্য একজন বিশেষ অফিসার নিযুক্ত করবেন। এই সাংবিধানিক ব্যবস্থার দ্বারা অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ এবং তপশিলি জাতি ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির উন্নতির জন্য সরকারের মাধ্যমে নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

সমাজের অবশিষ্ট সকল মানুষের মুক্তির ব্যাপারে ব্রাহ্মণদের উদ্যোগী হতে হবে। অধিত ও অর্জিত জ্ঞানকে স্ববর্ণের মধ্যে কুক্ষিগত করে না রেখে, ব্রাহ্মণদের দিক থেকে উচিত হবে তা সমাজের সকল বর্ণ ও জাতির মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করা। বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন যে, আধ্যাত্মিক শিক্ষালাভ করে যে-কোনো বর্ণের মানুষ ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করতে পারে। তাঁর মতানুসারে নিজেদের সামাজিক দুরবস্থার জন্য নিম্নবর্ণের মানুষ নিজেরাই দায়ী। এর কারণ হল তাঁরা সংস্কৃত শিক্ষা এবং আধ্যাত্মিকতা অর্জনের ব্যাপারে অনীহা দেখিয়েছে। অথচ এই পথে ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করা যায় সহজেই। সমাজের অব্রাহ্মণ ব্যক্তিবর্গকে সংঘাতের পথ পরিহার করতে হবে এবং সংস্কৃত শিক্ষা ও আধ্যাত্মিকতা অর্জনের মাধ্যমে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে হবে। বিবেকানন্দ জাতগত অসাম্য-বৈষম্যের সমস্যার সমাধানের উদ্দেশে উচ্চতরকে টেনে নিচে নামিয়ে না এনে নিম্নতরকে টেনে উপরে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন।

অস্পৃশ্যতার বিরোধিতা : স্বামী বিবেকানন্দ অস্পৃশ্যতার বিরোধিতা করেছেন। অস্পৃশ্যতামূলক আচরণকে স্বামীজি আন্তরিকভাবে ঘৃণা করেছেন। অস্পৃশ্যতার আচরণকে তিনি নির্বোধের আচরণ হিসাবে সমালোচনা করেছেন। ধর্মকে তিনি স্পৃশ্যতা-অস্পৃশ্যতার মধ্যে টেনে নামানোর বিরোধিতা করেছেন। ধর্মকে তিনি রান্নাঘরের ছোঁয়াছুঁয়ির বিষয়ে পরিণত করতে চাননি। কিছু মানুষকে জন্মগত বিচারে চিরতরে অচ্ছ্যুৎ করে রাখার তীব্র বিরোধিতা করেছেন বিবেকানন্দ। তিনি এ ধরনের অন্যায় ও অমানবিক প্রথা বা বিধিব্যবস্থার সম্পূর্ণ ও স্থায়ী বিলোপসাধনের পক্ষপাতী ছিলেন।

বিপ্লবী বিবেকানন্দ : স্বামী বিবেকানন্দ সামাজিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে একজন সংস্কারমূলক বিপ্লবীর ভূমিকা পালন করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে বিবেকানন্দ কখনই সামাজিক ক্ষেত্রে অন্যায়-অবিচারকে সহ্য করেননি এবং অন্যায়কারীর সঙ্গে আপস করেননি। তিনি অভিযোগ করেছেন যে, জাতভেদপ্রথার অমানবিক বিষয়াদি হল ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি। তিনি সকল ভারতীয়ের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধার অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণের পক্ষপাতী ছিলেন।

III-C.৬ জাতব্যবস্থা প্রসঙ্গে গান্ধীজির ভূমিকা (Role of Gandhiji with respect to Caste System)

বর্ণব্যবস্থার অধঃপতিত রূপ : মহাত্মা গান্ধী (অক্টোবর ২, ১৮৬৯—জানুয়ারী ৩০, ১৯৪৮)বিশ্বাস করতেন যে ভারতে হিন্দুসমাজের জাতব্যবস্থা হল বর্ণব্যবস্থার অধঃপতিত রূপ। এই জাতব্যবস্থা অকারণে দেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে অসাম্য-বৈষম্য ও ভেদাভেদের সৃষ্টি করেছে। তাঁর অভিমত অনুযায়ী ভগবানের সেবার জন্য সকলের সৃষ্টি এবং কোনো কাজই ছোট বা বড় নয়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সমাজে কোনো ব্যক্তিকে বিশেষ কোনো ভূমিকা প্রদানের অর্থ এই নয় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অন্যান্য ক্ষেত্রে তার অন্যান্য দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেল। একজন ব্রাহ্মণ তার দৈহিক পরিশ্রমের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে পারে না। অনুরূপভাবে আবার জ্ঞানার্জনের অধিকার থেকে একজন শূদ্রকে বঞ্চিত করা যায় না।

বর্ণাশ্রম ধর্মের সমর্থক : গান্ধীজি বর্ণাশ্রম ধর্মকে সামগ্রিকভাবে সমর্থন করেছেন। কিন্তু বর্ণাশ্রম ধর্মের অবক্ষয় ও অধঃপতন এবং বিকৃত ব্যবস্থা হিসাবে জাতপাতের ভেদাভেদব্যবস্থার উত্থানকে তিনি সমর্থন করেননি; তিনি তার বিরোধিতা করেছেন।

প্রাচীন ভারতের বর্ণব্যবস্থায় অন্তর্নিহিত প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শ্রেণিভিত্তিকরণ করা হয়েছে এবং তদনুসারে তাদের সামাজিক ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর অভিমত অনুযায়ী এই ব্যবস্থাই ব্যক্তিমানুষের উন্নয়ন এবং সামাজিক কল্যাণের পরিস্থিতি-পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে। সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ক গান্ধীজির ধারণা প্রাচীন ভারতীয় বর্ণব্যবস্থার উপর ভিত্তিশীল।

ভগবদ্গীতার উপর মহাত্মা গান্ধীর অগাধ বিশ্বাস ছিল। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সকল ক্ষেত্রে গীতা শাস্ত্রই পথের দিশা দিয়েছে। গান্ধীজির কাছে বর্ণব্যবস্থা সমাদৃত হয়েছে। এই সমাদরের পিছনে কাজ করেছে ভগবদ্গীতার উপর গান্ধীজির অপরিমেয় আস্থা ও বিশ্বাস। তিনি কিন্তু এ কথা স্বীকার করেননি যে, জাতব্যবস্থা বর্ণব্যবস্থারই অনুসিদ্ধান্তমূলক ফলাফল। বিভিন্ন বর্ণের বৃত্তি কঠোরভাবে সুনির্দিষ্ট করারও বিরোধিতা করেছেন তিনি।

মানবজীবন সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর সম্পূর্ণকারক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টত প্রতিপন্ন হয় একটি বক্তব্য থেকে। তিনি বলেছেন যে, অতিবড় বিদ্বান ব্যক্তিকেও শারীরিক পরিশ্রমের মাধ্যমে ক্ষুধার অন্ন অর্জন করতে হবে।

বর্ণব্যবস্থার সমর্থন, জাতপাতের বিরোধিতা : মহাত্মা গান্ধী বর্ণব্যবস্থাকে দ্ব্যর্থহীনভাবে সমর্থন করেছেন। কিন্তু তিনি জাতপাত ও অস্পৃশ্যতার ব্যবস্থার বিরোধিতা করেছেন। তিনি জাতপাতের ব্যবস্থাকে বর্ণব্যবস্থার অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে বিবেচনা করেননি।*

অসবর্ণ বিবাহের বিরোধী নন : মহাত্মা গান্ধী অসবর্ণ বিবাহের বিরোধিতা করেন নি। তিনি বিভিন্ন জাতের মানুষের সমপাঙ্‌ক্তেয়তাকে বা একসঙ্গে পাশাপাশি বসে পানাহারেরও বিরোধিতা করেননি। কিন্তু এ বিষয়ে অপরের ইচ্ছার বিরোধিতা করে তাকে বাধ্য করাকেও সমর্থন করেননি।

অস্পৃশ্যতার বিরোধিতা : গান্ধীজি হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্যতার আচরণকে পাপ হিসাবে বিবেচনা করেছেন। অস্পৃশ্যতার আচরণ হল ঈশ্বরের সৃষ্টি মানুষের বিরুদ্ধে পাপ। নিছক আইনমূলক ব্যবস্থাদির মাধ্যমে অস্পৃশ্যতার অভিশাপের অবসান অসম্ভব। অধিকাংশ হিন্দু যখন অনুধাবন করবে যে, অস্পৃশ্যতামূলক আচরণ ঈশ্বর ও মানুষের বিরুদ্ধে অপরাধ, তখনই সমাজদেহ থেকে এই দুষ্ট ব্যাধিটির নিরাময় হবে। পরিচ্ছন্নতা, নির্মলীকরণ বা স্বাস্থ্যবিধি হিসাবে বিচার-বিবেচনাকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর অভিমত অনুযায়ী বর্ণ হিন্দুদের হৃদয়ের পরিবর্তনের মাধ্যমে অস্পৃশ্যতার সমস্যার সুরাহা সম্ভব। গান্ধীজী হরিজনদের হিন্দু মন্দিরে প্রবেশাধিকারকে স্বীকার ও সমর্থন করেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি বর্ণ হিন্দুদের স্বীকৃতি বা অনুমোদনের বিষয়টির উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অর্থাৎ হিন্দুরা হরিজনদের গ্রহণ করলে তারা হিন্দু মন্দিরে ঢুকবে। গান্ধীজি হিন্দুসমাজে অবহেলিত অভাজনদের জন্য আন্তরিকতা ও সহানুভূতি দেখিয়েছেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি সংঘাত-সংঘর্ষমূলক পদক্ষেপের পরিবর্তে সদ্ভাব-সহযোগিতামূলক ব্যবস্থাদির উপর জোর দিয়েছেন।

মহাত্মা গান্ধী সমগ্র জীবনব্যাপী অস্পৃশ্যতার অপরাধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন এবং জারি রেখেছেন। তাঁর কর্মজীবনের পরিকল্পনাসমূহের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী ছিল অস্পৃশ্যতার অবসান। এ বিষয়ে তিনি বলেছেন: "Removal of untouchability means love for, and service of, the whole world, and thus merges into ahimsa." গান্ধীজির অভিমত অনুযায়ী বর্ণব্যবস্থা অস্পৃশ্যতার উৎস ত' নয়ই, বরং অস্পৃশ্যতার বিরোধী। তাঁর মতানুসারে সাম্য নীতির দাবি অনুযায়ী সামাজিক বৃত্তির ভিত্তিতে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ একেবারে অনুচিত।

মহাত্মা গান্ধী পিছড়েবর্গ বা হরিজনদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থাকে স্বীকার বা সমর্থন করেন নি। ধর্মান্তরিতকরণের প্রক্রিয়াকেও তিনি সমর্থন করেন নি, বরং বিরোধিতা করেছেন।

বস্তুত মহাত্মা গান্ধী জাতব্যবস্থা ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। শিক্ষার বিকাশ ও বিস্তারের মাধ্যমে তিনি তথাকথিত নিচুজাতের মানুষজনের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। তিনি অস্পৃশ্যদের আত্মোন্নয়নের কথা বলেছেন।

III-C.৭ জাতব্যবস্থা প্রসঙ্গে আমবেদ্‌কর-এর ভূমিকা (Role of Ambedkar with respect to Caste System)

দলিত মানুষের প্রতিনিধি : ভারতের ইতিহাসে অনগ্রসর ও অবহেলিত জনসম্প্রদায়সমূহের মধ্যে আমবেদ্‌কর (এপ্রিল ১৪, ১৮৯১—ডিসেম্বর ৬, ১৯৫৬) একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। পাণ্ডিত্যের ঔজ্জ্বল্যে এবং বৌদ্ধিক বিচক্ষণতায় আমবেদ্‌কর বিশিষ্ট। সুদীর্ঘকাল ধরে উপেক্ষিত এই ভারতীয় জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র স্বার্থ সংরক্ষণ ও সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য তিনি বিশেষভাবে ভাবনা-চিন্তা করেছেন।

* মহাত্মাগান্ধী আম্বেদকরের সমালোচনার জবাবে বর্ণব্যবস্থাকে সমর্থন করতে গিয়ে বলেছেন: "Varna and Ashramas are institutions which have nothing to do with castes. The law of Varna teaches us that we have each one of us to earn our bread by following the ancestral calling. I define not our rights, but our duties. It necessarily has ferences to callings that are conductive to the welfare of humanity and to no other. It also follows that there is no calling too low and none too high."

জাতভেদপ্রথা ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক-রহিত : আমবেদ্কর-এর অভিমত অনুসারে ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে জাতিগত স্তরবিন্যাস সামাজিক ও আর্থনীতিক বিচার-বিবেচনার উপর প্রতিষ্ঠিত। জাতভেদপ্রথাকে ধর্মীয় বিচার-বিবেচনার সঙ্গে সংযুক্ত করা অনুচিত। জাতভেদ প্রথাকে ধর্মীয় সমর্থন প্রদান হিন্দুধর্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্করহিত। জাতভেদব্যবস্থা হিন্দুধর্মের মূল বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতিসূচক নয়। হিন্দুদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যারা হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন না, বেদকে মানেন না, অথচ তাঁরা নিজেদের হিন্দু হিসাবে পরিচয় দেন। সামাজিক একটি বিশেষ শ্রেণিকে ধর্মীয় ভিত্তিতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করে দেওয়ার ফলে হিন্দু জনসম্প্রদায়ের প্রভূত ক্ষতিসাধন করা হয়েছে। দলিত শ্রেণির বহু মানুষ ধর্মান্তরিত হয়েছেন।

জাতিভেদপ্রথার বিরোধিতা : আমবেদ্করের মতানুসারে ভারতে জাতভেদপ্রথার পরিপ্রেক্ষিতে পেশাগত সামাজিক স্তরবিন্যাসের সৃষ্টি হয়েছে। এ ধরনের স্তরবিন্যাস সমাজজীবন বা জনজীবনের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর। কারণ হিন্দু সমাজব্যবস্থায় সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা ও নিয়ম-নিষেধের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। তার ফলে ব্যক্তি-মানুষের স্বাভাবিক ক্ষমতা ও প্রবণতা পদদলিত হয়। ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে মানবসমাজ গঠিত, এ ধারণা গতানুগতিক। আসলে সমাজ গঠিত হয় বিভিন্ন শ্রেণিকে নিয়ে। সামাজিক, আর্থনীতিক ও বৌদ্ধিক ভিত্তির পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের অন্তর্ভুক্ত শ্রেণিসমূহের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। হিন্দুসমাজের প্রত্যেকেই এ রকম কোনো-না-কোনো শ্রেণির সদস্য। এই ব্যবস্থা ব্যতিক্রমহীন। কিন্তু হিন্দু সমাজে এই শ্রেণিবিন্যাস জাতভেদপ্রথায় পরিণতি লাভ করেছে। আদিতে জাতি ছিল একটাই। কালক্রমে অনুকরণ ও বহিষ্করণের মাধ্যমে শ্রেণিসমূহ বিভিন্ন জাতে পরিণত হয়েছে। শ্রমবিভাজনের ব্যবস্থা ও নীতি সকল সভ্যসমাজেই স্বীকৃত। কিন্তু হিন্দুসমাজে জাতভিত্তিক শ্রমবিভাজনের ব্যবস্থাকে একটি অপরিবর্তনীয় ব্যবস্থা হিসাবে অনুমোদন করা হয়েছে। হিন্দুসমাজে এক-একটি জাত স্বতন্ত্র একটি সাংস্কৃতিক এককে পরিণত হয়। আমবেদ্করের অভিমত অনুসারে হিন্দুসমাজের জাতভেদপ্রথার এই চেহারা চরিত্র অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।

সমানাধিকারের অস্বীকৃতি : জাত-পাতভিত্তিক হিন্দু সমাজব্যবস্থার পিছনে ধর্মীয় ও নৈতিক অনুমোদন বর্তমান। হিন্দুসমাজের দুর্বলতার মূল কারণ এর মধ্যেই নিহিত আছে। হিন্দুসমাজের এক শ্রেণির মানুষকে যাবতীয় মানবিক অধিকার থেকে স্থায়ীভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং তাদের উপর যাবতীয় দায়িত্বপালনের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। অস্পৃশ্যতার ছাপ লাগিয়ে দিয়ে তাদের জন্য সকলরকম মানবিক সুযোগ-সুবিধাকে অস্বীকার করা হয়েছে। হিন্দুসমাজের উচ্চবর্ণের মানুষরা সকলরকম সুযোগ-সুবিধা, বিশেষাধিকার ও অব্যাহতি ভোগ করে। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা আবার সমাজের তথাকথিত অচ্ছ্যুৎ সম্প্রদায়ের মানুষের উপর সকল রকম অন্যায় ও অমানবিক আচরণের অধিকারও ভোগ করে। আমবেদ্করের অভিমত অনুসারে হিন্দু ধর্ম সর্ববিষয়ে বিশেষভাবে উদার প্রকৃতির। অথচ এই ধর্মে অস্পৃশ্য বলে সমাজের একটি শ্রেণিকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও অচ্ছ্যুৎ করে রাখা হয়েছে। সমাজের একটি শ্রেণিকে এইভাবে অচ্ছ্যুৎকরণের বিষয়টি হিন্দুধর্মের অনুমোদন লাভ করেছে। অস্পৃশ্য বলে চিহ্নিত এই শ্রেণিটির ব্যক্তিবর্গকে মানুষ হিসাবে মর্যাদা দেওয়া হয় নি। সমাজের অন্য সকলের সঙ্গে তারা মেলামেশার অযোগ্য বলে মনে করা হয়। হিন্দুসমাজে এইভাবে স্পৃশ্য-অচ্ছ্যুৎ বিভাজন অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। হিন্দুসমাজের জাতভেদপ্রথা ধর্মীয় অনুমোদনের ভিত্তিতে স্বীকৃত ও সংরক্ষিত। শিক্ষার বিস্তার, সামাজিক সংস্কার বা সাম্যের শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতির মাধ্যমে এই জাতিভেদপ্রথার অবলুপ্তি অসম্ভব।

সামর্থ্য ও গুণগত যোগ্যতা নির্বিশেষে এই সমাজে জাতগত বিচারে ব্যক্তির বৃত্তি নির্ধারিত হয়। এবং জাতিগত বিচারে বৃত্তির এই বিন্যাস অপরিবর্তনীয়। সামাজিক জীবনে অসাম্যই হল হিন্দু সামাজিক সংগঠনের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। মানুষের জন্মগত বা জাতগত পার্থক্যের উপর যাবতীয় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সামাজিক জীবনে অসাম্য হল হিন্দু সামাজিক সংগঠনের মৌলিক নীতি। এখানে বর্ণ ও জাতব্যবস্থার উপর সমাজ প্রতিষ্ঠিত। সামাজিক প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিকে এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এখানে বর্ণ ও জাতের গুরুত্বই অধিক। আদিতে ছিল চতুর্বর্ণ। আমবেদ্করের অভিমত অনুযায়ী বর্ণের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে হয়েছে পাঁচ। অস্পৃশ্য জনসম্প্রদায় পঞ্চম বর্ণ হিসাবে সংযুক্ত হয়েছে। প্রতিটি বর্ণের অন্তর্ভুক্ত জাতগোষ্ঠীসমূহ আবার বিভিন্ন উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত। ব্রাহ্মণদের মধ্যেই বিভিন্ন বিভাজন বর্তমান। বিভিন্ন জাতগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক রীতি-নীতি, প্রথা-প্রকরণ, বৈবাহিক বিধি-ব্যবস্থা, খাদ্যাখাদ্যের বাছ-বিচার

প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রভূত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। স্বভাবতই হিন্দুরা একটি সুসংহত জনসম্প্রদায় হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে নি। জাতভেদপ্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দুসমাজে ব্যক্তি-মানুষের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও বিশেষাধিকারসমূহ জাতগত বিচার-বিবেচনার ভিত্তিতে নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়; মানুষের সামর্থ্য-অসামর্থ্য বা গুণগত যোগ্যতা-অযোগ্যতা এ ক্ষেত্রে গুরুত্বহীন প্রতিপন্ন হয়।

সামাজিক অস্বীকৃতি : বর্ণ ও জাতগত ভিত্তিতে স্তরবিন্যস্ত সামাজিক ব্যবস্থা সংরক্ষণের দায়িত্ব নৃপতিদের উপর ন্যস্ত ছিল। নিচুজাতের মানুষ শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। নিচুজাতের এই মানবগোষ্ঠীর সামাজিক ও আর্থনীতিক অবস্থান ও মর্যাদা চিরকালের জন্য স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট ছিল। কোনোরকম পরিবর্তন বা সমালোচনার সুযোগ ছিল না। অর্থাৎ জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই কিছু মানুষের উপর অসামর্থ্যসূচক কিছু অক্ষমতা চিরকালের জন্য আরোপ করা হয়।

হিন্দুসমাজের ধারণা সঠিক নয় : আমবেদ্‌করের অভিমত অনুসারে প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দুসমাজ হিসাবে কোনোকিছুর পরিচয় পাওয়া যায় না। আসলে হিন্দুসমাজ হল বেশকিছু জাতগোষ্ঠীর সমাহার বিশেষ। এই সমাজের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি জাতগোষ্ঠী নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পর্কে সতত সচেতন। হিন্দুসমাজ হল জাতসমূহের এক ব্যবস্থা বিশেষ। এই ব্যবস্থার অন্তর্গত প্রতিটি জাতের বিভিন্ন অধিকার ও উদ্দেশ্য বর্তমান। সুতরাং একে হিন্দুদের সমাজ হিসাবে অভিহিত করা যায় না। সমাজ হবে ব্যক্তিবর্গের একটি সংগঠিত ব্যবস্থা এবং সমাজের একটি সাধারণ উদ্দেশ্য থাকবে। হিন্দুসমাজের মধ্যে তা নেই।

অস্পৃশ্যদের উপর অবিচার : হিন্দু ধর্মে অস্পৃশ্যকে মানুষ হিসাবে স্বীকার করা হয় না, অস্পৃশ্যের সঙ্গে সংযোগ-সম্পর্ক অস্বীকৃত। অস্পৃশ্যদের উপর অমানবিক আচরণের অসংখ্য নজির আমবেদ্‌কর তাঁর বিভিন্ন রচনায় তুলে ধরেছেন। উচ্চবর্ণের ডাক্তার অস্পৃশ্যতার অভিযোগে রোগীর চিকিৎসা করেন নি। অস্পৃশ্যতার কারণে বালককে ধর্মশালায় ঢুকতে দেওয়া হয় নি। অস্পৃশ্যতার কারণে দুর্দশাগ্রস্ত মহিলাকে সাহায্য করা যায় নি। অস্পৃশ্য জনসম্প্রদায়ের মানুষের খাদ্যাখাদ্যের উপর হিন্দুসমাজ নিয়ম-নিষেধ আরোপ করে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক-আশাক পরিধানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে।

মানবাধিকারের জন্য আন্দোলন : আমবেদ্‌কর বিশ্বাস করতেন যে, জাতভেদপ্রথার বিনাশসাধন ব্যতিরেকে অস্পৃশ্যতার অভিশাপের অবসান অসম্ভব। তাঁর মতানুসারে একই সামাজিক ব্যবস্থার অভিন্ন নীতির উপর জাতভেদ ব্যবস্থা ও অস্পৃশ্যতার ধারণা প্রতিষ্ঠিত। জাতিভেদ প্রথা আছে বলেই অস্পৃশ্যতা আছে। এই কারণে আমবেদ্‌কর উচ্চ-নিচ জাতভেদব্যবস্থার অবসানের ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করেন। সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সকলের সমানাধিকারের উপর তিনি জোর দেন। দলিত জনসম্প্রদায়সমূহের অধিকার আদায়ের আন্দোলন সংগঠনের কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীগুলির পানীয় জলের অধিকার এবং মন্দিরে পূজার্চনার অধিকার আদায়ের জন্য আমবেদ্‌কর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সামিল হন। এক্ষেত্রে 'কলা রাম মন্দির সত্যাগ্রহ', 'মহদ ট্যাঙ্ক সত্যাগ্রহ', 'মনুস্মৃতি পোড়ানো' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মহারাষ্ট্রের সত্যশোধক আন্দোলনের নেতৃবর্গ এ বিষয়ে আমবেদ্‌করের উদ্যোগ-আয়োজনকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেন। মানবাধিকারের জন্য আমবেদ্‌করের এই আন্দোলন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বলাভ করে। জাতভেদপ্রথা এবং অস্পৃশ্যতামুক্ত হিন্দুসমাজ সংগঠনের ক্ষেত্রে আমবেদ্‌করের উদ্যোগ-আন্দোলন বিনাবাধায় পরিচালিত হতে পারে নি। এ ক্ষেত্রে বর্ণ হিন্দুরা প্রবল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে।

চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার বিরোধিতা : আদর্শ সামাজিক সংগঠনের স্বার্থে আমবেদ্‌কর স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এবং এই কারণে তিনি হিন্দুসমাজের চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার বিরোধিতা করেছেন। চতুর্বর্ণের ব্যবস্থা সামাজিক সংগঠনের সর্বাধিক ক্ষতিকর বিষয়। চতুর্বর্ণ সমাজব্যবস্থাকে দুর্বল করে, পঙ্গু করে এবং মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়। এ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আমবেদ্‌করের সুস্পষ্ট মতপার্থক্য ছিল। গান্ধীজি অস্পৃশ্যতার বিরোধিতা করেছেন, কিন্তু চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন নি। সামাজিক সংগঠনের ক্ষেত্রে আদর্শ ব্যবস্থা হিসাবে চতুর্বর্ণকে মহাত্মা গান্ধী সমর্থন করেছেন।

চতুর্থ বর্ণ হিসাবে শূদ্রদের সৃষ্টি : আমবেদ্‌কর চতুর্থ বর্ণ হিসাবে শূদ্র বর্ণের উৎপত্তির ইতিহাস ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতানুসারে আদিতে তিনটি বর্ণ ছিল। চতুর্থ বর্ণ হিসাবে শূদ্ররা ছিল না। এ বিষয়ে আমবেদ্‌কর হিন্দু ধর্মশাস্ত্রসমূহ এবং হিন্দু সমাজব্যবস্থার ক্রমবিবর্তন গভীরভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতানুসারে

নিজেদের কায়েমী স্বার্থের অনুকূলে জাতভেদপ্রথাকে সুদৃঢ় করার জন্য ব্রাহ্মণরা যাবতীয় উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করেছে। আদিতে হিন্দুসমাজ কতকগুলি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। ব্রাহ্মণরা হিন্দু সমাজের এই শ্রেণীবিন্যাসকে বিকৃতির এক নতুন মাত্রা প্রদান করেছে। আমবেদ্‌কারের অভিমত অনুসারে শূদ্ররা হল আর্য জনসম্প্রদায়সমূহেরই একটি অংশ। ভারতীয় আর্যসমাজে শূদ্ররা ক্ষত্রিয়দেরই একটি অংশ ছিল। শূদ্রদের বেদপাঠের অধিকার ছিল। আমবেদ্‌করের অভিমত অনুযায়ী শূদ্র নৃপতিদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের বিরোধ সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। এই বিবাদ-বিসংবাদের সময় ব্রাহ্মণদের উপর স্বৈরাচারমূলক আচরণ করা হয়েছে এবং বিবিধ অমর্যাদাকর আচরণ আরোপ করা হয়েছে। এই সময় শূদ্ররা ছিল আসলে ক্ষত্রিয়। এই ঘটনার স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হিসাবে ব্রাহ্মণদের মধ্যে শূদ্রদের বিরুদ্ধে গভীর ঘৃণার সৃষ্টি হয়। ব্রাহ্মণরা শূদ্রদের উপনয়ন সংস্কারে অস্বীকৃতি জানায়। শূদ্ররা যারা ছিল আসলে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণরা তাদের উপনয়ন করতে অস্বীকার করায় সামাজিকভাবে তাদের অধোগতি ঘটল। তাদের স্থান হল বৈশ্যদের নীচে। এইভাবে শূদ্ররা চতুর্থ বর্ণ হিসাবে বিবেচিত হল। আমবেদ্‌কর তাঁর Who were Shudras শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতানুসারে বর্ণভেদব্যবস্থা এবং শূদ্রকে নিম্নতম বর্ণের মানুষ হিসাবে প্রতিপন্ন করার উদ্যোগ শুরু হয়েছে পরবর্তীকালে। আমবেদকর এ ক্ষেত্রে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, ম্যাক্সমুলার, ম্যাক্স ওয়েবার প্রমুখ চিন্তাবিদদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন।

সুস্থ সমাজজীবনের স্বার্থে শূদ্রদের কাজকে অপরিহার্য বিবেচনা করা হয়। মেথরের কাজ, ঝাড়ুদারের কাজ প্রভৃতি কাজকর্মকে সমর্থন করা হয়। অথচ এই সমস্ত কাজ যারা করে তাদের ঘৃণা করা হয়। আমবেদ্‌কর হিন্দুসমাজের এই মানসিকতার তীব্র বিরোধিতা করেছেন।

সামাজিক সংস্কার আন্দোলন : আমবেদ্‌করের অভিমত অনুযায়ী হিন্দুসমাজের অবক্ষয়ের মূল কারণ হল প্রবল জাতিভেদপ্রথা। ব্রাহ্মণরা বৌদ্ধিক বিচারে সবসময় উন্নত নয়। অথচ তারা সমগ্র সমাজব্যবস্থার উপর আধিপত্য করে আসছে। এই ব্রাহ্মণবাদ বা হিন্দুসমাজের গোঁড়ামি ও আধিপত্যবাদ হিন্দুসমাজে অনৈক্যের সৃষ্টি করেছে এবং অবক্ষয়ের পথ সুগম করেছে। চতুর্বর্ণের বাইরে আছে এক বৃহৎসংখ্যক জনগোষ্ঠী। এদের অস্পৃশ্য করে রাখা হয়েছে। এই অস্পৃশ্য জনসম্প্রদায়ের জন্য মানবিক অধিকারসমূহ আদায়ের দায়িত্ব আমবেদ্‌কর নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। জীবনধারণের পরিবেশ-পরিমণ্ডলের উপর ব্যক্তি-মানুষের জীবনের সম্ভাবনাসমূহের বিকাশ নির্ভরশীল। এবং তদনুসারে ব্যক্তির ভাগ্য নির্ধারিত হয়। অচ্ছ্যুৎ জনগোষ্ঠীকে এক প্রতিকূল পরিবেশে বসবাস করতে বাধ্য করা হয়। তার ফলে তাদের জীবনের সম্ভাবনাসমূহের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। সুস্থ মানবজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় পৌর অধিকারসমূহ থেকে তারা বঞ্চিত হয়; দলিত জীবনযাপনে তারা বাধ্য হয়। এই অস্পৃশ্য জনসম্প্রদায়ের সভ্য জীবনযাপনের জন্য অপরিহার্য পৌর অধিকারসমূহ আদায় করা আবশ্যক, অন্য সকল জনসম্প্রদায়ের সঙ্গে এদেরও সমানাধিকারসম্পন্ন করা দরকার। আর এসবের জন্য আবশ্যক হল হিন্দু সমাজব্যবস্থার মৌলিক সংস্কার সাধন বা বৈপ্লবিক রূপান্তর। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমবেদ্‌কর শক্তিশালী সামাজিক সংস্কার আন্দোলন সংগঠনের ব্যাপারে যাবতীয় উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করেছেন।

III-C.৮ | জাত-শ্রেণি অবিচ্ছিন্নতা (Caste-class Continuum)

'শ্রেণি'র চূড়ান্ত অভিব্যক্তি হিসাবে 'জাত' : সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকে 'জাত'-কে শ্রেণির (class) এক চূড়ান্ত অভিব্যক্তি হিসাবে গণ্য করার পক্ষপাতী। এই শ্রেণির চিন্তাবিদদের অভিমত অনুসারে সামাজিক শ্রেণির সাংগঠনিক ব্যবস্থার মধ্যে জন্মগত বিচারে সামাজিক স্থান বা মর্যাদার উর্ধ্বাধঃ বিন্যাস নির্ধারিত হয়, তখন শ্রেণির ধারণা চূড়ান্ত বিচারে জাতে রূপান্তরিত হয়।* এ প্রসঙ্গে হেনরি মেইন-এর বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর অভিমত অনুযায়ী জাতের সৃষ্টি হয়েছে পেশাগত স্বাভাবিক শ্রেণিবিভাজনের ভিত্তিতে। কালক্রমে এই শ্রেণিবিভাজন ধর্মীয় অনুমোদন লাভ করে ও সুদৃঢ় হয়। এইভাবে বর্তমান জাতব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটে। সুতরাং ধর্মীয় বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে হিন্দুসমাজে আবির্ভূত হয়েছে জাতভেদ প্রথা। এই ধর্মমতই

* অধ্যাপক ম্যাকাইভার বলেছেন : "When status is wholly predetermined, so that men are born to their lot without any hope of changing it, then class takes the extreme form of caste."